সংসার-সমাজের ঘেরাটোপে প্রবীণ নারী

আফরোজা অদিতি

জন্মের পর থেকেই মানুষের বৃদ্ধির শুরু। এই বৃদ্ধি শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে, কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে, তারুণ্য পেরিয়ে পৌঢ়ত্বে আর পৌঢ়ত্ব পেরিয়ে মানুষ পৌঁছে যায় বার্ধক্যে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে থাকে মানবদেহের। বিকশিত হয় বুদ্ধিবৃত্তির এবং পালটাতে থাকে নবীনের খোলনলচে। এই নবীনত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে প্রবীণত্বের বীজ আবার প্রবীণের অস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয় নতুন নবীনের জগৎ! মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে প্রবীণ হতেই হবে। প্রবীণ হওয়ার হাত থেকে কারো রেহাই নেই। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, হয়ত একটু দেরিতে কেউ, কেউ-বা তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে; বস্তুত বেঁচে থাকলে কেউই তার বার্ধক্যে পৌঁছানোর পথ আটকাতে পারে না, পারবে না কখনো। কোনো অঘটন না ঘটিয়ে জীবন স্বাভাবিকভাবে চললে প্রবীণ অবস্থায় পৌঁছানোর পরেই তার মৃত্যু হবে। কারণ মানুষ দেবতাদের মতো অমর নয়।

যদিও প্রবীণকে চিহ্নিত করা হয় বয়স দ্বারা, তবু আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বার্ধক্যের বয়স কাঠামো ভিন্নতর হয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলোতে ৬৫ বছর বয়সী ব্যক্তিকে প্রবীণ হিসেবে ধরা হলেও ৬০ বছর বয়সকে প্রবীণসীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘ। তবে বাংলাদেশে দারিদ্র্য, ক্রয়ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা পরিচর্যা ও নিরাপত্তার অভাবে ৬০ বছরের আগেই জীবনে বার্ধক্য নেমে আসে। অবসরের বয়সসীমা বিবেচনায় ৬০ বছর হলেই প্রবীণ। কিন্তু বাংলাদেশে প্রবীণ হিতৈষীর বিবেচনায় ৫৫ বছর থেকে তদূর্ধ্ব বয়সীরাই হলেন প্রবীণ।

প্রবীণ বয়সকে ভাগ করলে প্রবীণতার তিনটি ধাপ দেখতে পাওয়া যাবে : ১. তরুণ প্রবীণ, ২. প্রৌঢ় প্রবীণ ও ৩. অতি প্রবীণ। সাধারণত তরুণ ও প্রৌঢ় প্রবীণরা সক্ষম আর অতি প্রবীণরা অক্ষম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রবীণজীবন দুই ধরনের, সক্ষম ও অক্ষম। সক্ষম প্রবীণেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারেন, কিন্তু অক্ষম প্রবীণেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারেন না। অতি প্রবীণ অর্থাৎ কাজ করতে অক্ষম প্রবীণ বয়সকে তাই বলা হয় 'দ্বিতীয় শৈশব'। কারণ প্রবীণ বয়সে মানুষ শিশুর মতো হয়ে যান। শিশুর আচরণের সঙ্গে একজন প্রবীণের আচরণের পার্থক্য করতে গিয়েই সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ শিশুর কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রবীণের থাকে।

বিশ্বের মোট নারী জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের বেশি। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ মানুষ প্রবীণ। এখানে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী হলেও প্রবীণ নারীর কোনো পৃথক পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশে প্রবীণদের ৭৮ শতাংশ বিধবা। এই হিসেবে দেখা যায়, মোট প্রবীণ জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ বিধবা হলে প্রবীণ নারী ৭৮ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ২২ শতাংশ প্রবীণ পুরুষ। তবে প্রবীণ বিধবা ও প্রবীণ নারীর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। কারণ মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে এবং নারী সাধারণত পুরুষের চেয়ে দীর্ঘজীবী হয়। এই হিসেবে দেখা যায় যে প্রবীণ পুরুষের তুলনায় প্রবীণ নারীর সংখ্যা বেশি। বেশিদিন বেঁচে থাকলে সক্ষম অবস্থা থেকে মানুষ ক্রমশ অক্ষমতার

দিকে এগিয়ে যায়; আর যত অক্ষম হয় তত তাদের যন্ত্রণা বাড়ে! প্রবীণ অবস্থায় পুরুষ-নারী উভয়েই পৌঁছুলেও পুরুষের চেয়ে নারী বেশিদিন বাঁচে বলে বার্ধক্যে নারীর যন্ত্রণা বেশি।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ৫০ লক্ষ প্রবীণের আবাসনের নিশ্চয়তা নেই। কারণ অতি দরিদ্র প্রবীণদের আবাসনের আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাদের অনেকেই (২১ শতাংশ) তিন বেলা খেতে পান না। তাদের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের এড়িয়ে চলে, তখন তারা হতাশাক্রান্ত হয়ে জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যান। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, পরিবারে রান্না হলেও ৮৯ শতাংশ প্রবীণ মাংস খেতে পান না। এই সমাজের একটি দিক হলো মাছ-মাংস বা ভালো খাবার যাই হোক, আগে শিশু (মেয়েশিশুকে যদিও কম দেওয়া হয়), তারপরে বাড়ির উপার্জনক্ষম ব্যক্তি খাবে তারপরে অন্যরা। সেই হিসেবে তরুণী নারীরা যেটুকু খেতে পায়, সেটুকুও প্রবীণ নারী খেতে পান না।

পুরুষনির্ভর সমাজে নারী এক নির্ভরশীল গৃহপালিত প্রাণী। স্বাধীনতা আন্দোলনের এতগুলো বছর পার হলেও এই অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এখনো পিতা, স্বামী, পুত্রের অভিভাবকত্বে বাস করে। এখনো তাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে পথে-ঘাটে চলাফেরা করতে হয়। বর্তমানে নারীরা কাজ করে ঘরে ও বাইরে। বাইরে কাজ করে তারা যে উপার্জন করে, সে উপার্জন খুব কম নারীই তাদের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে। আর ঘরের কাজের মূল্য তো নেই-ই। যেহেতু উপার্জনের অর্থ তাদের হাতে থাকে না, সেহেতু প্রবীণ বয়সে তাদের পরমুখাপেক্ষী আরো বেশি করে হতে হয়। মানুষ এখন যৌথ পরিবারের চেয়ে অণু পরিবারে বাস করা পছন্দ করছে, ফলে বেশিরভাগ প্রবীণ খুব একা হয়ে যান। সামাজিক রীতি অনুযায়ী মেয়ে বিয়ে হলে এখনো অন্যের সংসারে চলে যায়। আর ছেলেদের কেউ কেউ বিদেশে চলে যায় কেউ-বা কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। ফোনে তারা প্রবীণ বাবা-মায়ের খবর নেন। কখনো কখনো সময় হয় না খবর নেবার। অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্থান হয় প্রবীণাবাসে!

রক্ষণশীলতা : সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় মানুষকে। মানিয়ে চলতে পারলে বার্ধক্য যখন দুয়ারে উপস্থিত হয় তখন তার কোনো অসুবিধা হয় না। যে মানুষ এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না, সে-ই প্রবীণ বয়সে মানসিক কষ্ট ভোগ করে এবং অসহায়ত্বের শিকার হয়। স্বভাবতই প্রবীণ মানুষ একটু রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হন। পুরুষের তুলনায় নারীরা রক্ষণশীল হন বেশি।

মানুষ রক্ষণশীল হলেও শৈশব-কৈশোরের হাসি-আনন্দ, যৌবনের দৌড়ঝাঁপ পেরিয়ে একসময় বার্ধক্যে পৌঁছাবে এটা জানা কথা। এজন্য তরুণ বয়সেই বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিতে হয়। এই সমাজে নারী যেহেতু পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, কাজেই স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীকে যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয় সেজন্য সময় থাকতেই ব্যবস্থা করে যেতে হবে। প্রবীণতা জীবনে একদিনে আসে না বা হঠাৎ করে আসে না। জীবন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ক্ষণে পৌঁছায়। জীবনের এই সময়টা আসবে না তা কেউ বলতে পারে না। বেঁচে থাকলে এই পথ বেয়েই চলতে হবে তাকে। তাই সময় থাকতেই প্রবীণক্ষণ নিয়ে ভাবতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। এই সোশ্যাল প্ল্যানিং জীবনের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। ছেলেমেয়েকে বড়ো করার সময় শুধু ছেলেমেয়ের কথা ভাবলেই হবে না, সেই সঙ্গে নিজের কথাও ভাবতে হবে। ছেলেমেয়ে একসময় বড়ো হবে, তাদের নিজ নিজ জীবনের ক্ষেত্রে তারা বিচরণ করবে। তখন তারা (স্বামী-স্ত্রী) কী করবেন? এই বিষয়টা ভাবা গুরুত্বপূর্ণ এবং তরুণ বয়স থেকেই তা ভাবতে হবে।

সংসারে প্রবীণ নারীর অবস্থান : অধিকাংশ প্রবীণ নারী অর্থ সংকটে থাকেন, কারণ উপার্জন করলেও তাদের উপার্জনের অর্থ কখনোই তাদের নিজেদের থাকে না। তরুণ বয়সে যে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংসার চলে যায় অন্যের হাতে। চাকুরিজীবী নারীরা রিটায়ার করার পর পেনশনলব্ধ অর্থের ব্যবহার নিজেরা করতে পারেন না। জোরজবরদস্তি বা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কারণেই হোক অন্যদের দিয়ে দিতে বাধ্য হন। এই সমাজের বিধিবদ্ধ ধারণা হলো বয়স হলে অর্থের কোনো প্রয়োজন থাকে না! সংসার সন্তানের দেখভাল করতে হয় না, সংসারের কোনো কাজে অর্থ ব্যয় করতে হয় না, তাহলে অর্থের কী প্রয়োজন! কোনো কিছুর দরকার হলে সন্তানেরা আছে, দেখভালের অভাব হবে না। বয়সকালে টাকা টাকা না করে আল্লা-খোদা-ভগবানের নাম করতে বলে এই সমাজ।

উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের খুব অসুবিধে হয় না, কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের অসুবিধে হয়। কারণ প্রবীণ বয়সেও তাদের কাজ করতে হয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষিনির্ভর। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কৃষিকাজ করেন। প্রবীণ বয়সে কৃষিকাজ করতে গিয়েও তারা বৈষম্যের শিকার হন। তা ছাড়া, কৃষিকাজে অবসর নেই, যতদিন বিছানাগত না হন ততদিনই কাজ করতে হয়। সন্তানরা দেখভাল না করলে নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রবীণ নারীদের অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তিও করতে হয়। এ ছাড়া, যে প্রবীণ নারী চাকরি না করে সংসারে সময় দিয়েছেন তার অবসরের সময়সীমা নেই! বয়স বাড়লেও অনেক সময় নাতি-নাতনিদের দেখাশোনার ভার থাকে তার ওপরে। কখনো কখনো স্কুলে আনা-নেওয়া করতে হয় তাদের। সংসারে থাকলে রান্নাবান্নাও করতে হয়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা : বাংলাদেশে নারীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। জন্মের পর থেকেই একটি মেয়েকে সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়। পদে পদে তাকে বিপদ-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীন দেশে বসবাস করেও একটি মেয়েকে পরাধীনতার অদৃশ্য শিকল পরে থাকতে হয়! শৈশব থেকেই শুরু হয় তার মতামতকে উপেক্ষা করা বা পাত্তা না দেওয়া। প্রায়ই নারীরা যৌক্তিক মত দিলেও তা মেনে নেওয়া হয় না। বারবার এইরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হতে বেশিরভাগ মেয়ে তাদের মত প্রকাশের দরজায় কলুপ এঁটে থাকে। অবমূল্যায়িত অবদমিত জীবনবোধ নিয়ে একজন নারী প্রবীণ জীবনে পা রাখেন। এই বয়সে এসেও আর মতপ্রকাশে ইচ্ছা জাগাতে চান না! কারণ মতপ্রকাশ করলে পূর্বে শুধু স্বামী কিংবা অন্য গুরুজনদের কাছ থেকে বাক্যবাণ শুনতে হতো। প্রবীণ বয়সে সন্তান, নাতি, কখনো কখনো ছেলে-বউদের কাছ থেকে শুনতে হয় 'চুপ থাকো, তুমি কী জানো?' ওদেরও দোষ নেই। কারণ এভাবেই সংসারে নারীকে নিগৃহীত হতে দেখে দেখে বড়ো হয়েছে তারা! এমনিতেই প্রবীণ অবস্থায় জীবনকাঠামো বদলে যায়। তার ওপরে এমন ধরনের কথা শুনলে মানসিক অশান্তি আরো বাড়ে। তাই অধিকাংশ প্রবীণ নারী কথা বলাই ছেড়ে দেন এবং বিষণ্নতার মধ্যে দিন কাটান।

অবসর : বর্তমানে অবসরে যাওয়ার বয়স ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯ বছর। বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৭ বছর। নারীরা শিক্ষিত হচ্ছেন! তাদের মধ্যে অনেকে চাকরিও করছেন, কিন্তু সে অর্থ তাদের নিজেদের খরচ করার অধিকার নেই। চাকরি শেষে পেনশনে গেলে তারা যে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাও তারা নিজেরা খরচ করতে পারেন না। স্বামী বেঁচে থাকলে তো সেই অর্থ তারই থাকে, আর স্বামীর অবর্তমানে সন্তানেরা সে অর্থ ছলেবলে কৌশলে নিজের করে নেয়। যদি এক সন্তান থাকে এবং সেই সন্তান তার দেখভাল করার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে তার ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে, নাহলে পথে।

আর একের অধিক সন্তান থাকলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি দৌড়ে বেড়াতে হয়! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৃদ্ধা মায়ের ভার কেউই বহন করতে চায় না! কথায় আছে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। আমাদের নারীরা এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

অবসর যাপন নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক হয়, কারণ পুরুষ অবসরে গেলেও তার সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ হয় না! যতক্ষণ অবসরী-পুরুষটি নড়াচড়া করতে সক্ষম থাকেন, ততক্ষণ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে বসতে পারেন। একটা আড্ডার জায়গা তৈরি করে কয়েকজন মিলিত হয়ে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন। কিন্তু নারীর পক্ষে সেটি সম্ভব হয় না! গ্রামে হলে কখনো এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে পান-পাতা খেয়ে গল্পগুজব করে আসতে পারেন (যদি কোনো বাড়ির প্রবীণ নারীর কাজ না থাকে)! কিন্তু সক্ষম প্রবীণ নারীদের সংসারের কাজ করতেই হয়। ব্যতিক্রম যে নাই তা নয়, কিন্তু একটি-দুটি ব্যতিক্রম দিয়ে সমাজ বিচার চলে না!

স্বাস্থ্য : প্রবীণ নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাস্থ্যগত পার্থক্য খুব একটা না থাকলেও আছে। নারী সন্তানের ধারক-বাহক-পালক। নারী যখন তরুণ থাকে, তখন তার সন্তান ধারণ করতে হয়। সন্তান ধারণকাল থেকে প্রসবের সময় পর্যন্ত নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রসবের পরে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় থেকে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। ভিটামিন-আয়রনের ঘাটতি। এরপরে প্রসবজনিত কারণে আরো অনেক রকমের অসুবিধা নারীর হয়। এই অসুবিধাগুলো কোনো পুরুষকে বহন করতে হয় না। এরপর নারী ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে প্রবীণে পরিণত হয়। প্রবীণ বয়সে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আরো বাড়ে। কারণ তখন শরীরের ক্যালসিয়াম শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। নারীর প্রধান সমস্যা হলো তারা নিজেদের ভালোবাসে না। ভালোবাসে তাদের স্বামী-সন্তান-পরিবার। সবার জন্য চিন্তা করতে করতে এবং সকলের যত্ন নিতে নিতে তারা নিজেদের অবস্থা ভুলে যায়। প্রবীণ অবস্থায় দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য তরুণ বয়সেই সুষম খাদ্যতালিকা করা প্রয়োজন। কায়িক শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী একজন নারীর দৈনিক ক্যালোরির প্রয়োজন ১৮০০। কিন্তু তারা তা পায় না কখনো! তরুণ বয়সেই অনেক নারী পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। আবার অনেক প্রবীণের তিনবেলা খাবারই জোটে না। পুষ্টিকর খাবার কোথায় পাবে?

অপরাধবোধ : অতি প্রবীণ অর্থাৎ কাজ করতে অক্ষম প্রবীণ-বয়সকে বলা হয় মানুষের 'দ্বিতীয় শৈশব'। কারণ প্রবীণ বয়সে মানুষ হয়ে যায় শিশুর মতো। শিশুর আচরণের সঙ্গে একজন প্রবীণের আচরণ পার্থক্য করতে গিয়েই সংসারে সৃষ্টি হয় অশান্তির। এর কারণ শিশুর কোন অভিজ্ঞতা থাকে না কিন্তু প্রবীণের থাকে অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয় অপরাধবোধ। কাজ করতে না পারার অপরাধবোধ! ভুলবশত হঠাৎ করে কোনো কিছু নষ্ট করে ফেলার জন্য অপরাধবোধ! কারণ মানুষ যখন প্রবীণ হয় তখন শরীরের পরিবর্তনে কখনো তাদের হাত কাঁপে, কখনো মাথা ঘুরে যায় হঠাৎ। এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাতেও প্রবীণ-মনে অপরাধবোধ কাজ করে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৌঢ় প্রবীণদের অর্থাৎ যারা প্রবীণ বয়সের দ্বিতীয় ধাপে অবস্থান করেন তাদের হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাসার প্রবীণ সদস্য পানি খেতে গিয়ে গ্লাস উলটে ঘরময় পানি ছড়িয়ে পড়লে কখনো একটা বাড়তি ঝামেলা হয় পরিবারের অন্যান্যের জন্য। যদি ওই প্রবীণ নারী মুছতে অপারগ হন তাহলে তো কথাই নেই। অনেক সময় কোমর বা হাঁটুর ব্যথায় এটি করতে পারেন না তিনি। তখন এই কাজটি যিনি বা যারা

করছেন, তারা বাড়তি কাজের জন্য সরাসরি ওই প্রবীণের ওপর রাগ করেন কিংবা নিজের মনে গজর-গজর করতে থাকেন! তখন ওই প্রবীণ মানুষটি অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন।

জন্মেই প্রবীণ হয় না মানুষ। অনেকগুলো স্তর পার হয়ে তবেই তারা প্রবীণ হয়। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব তারপর অতি প্রবীণ। এক-দুই-তিন করে বাড়ে বয়স। বাড়তে বাড়তে যখনই ষাটের কোঠায় পৌঁছায়, তখনই তাকে প্রবীণের পর্যায়ে ফেলা হয়। বয়স বাড়ে, বাড়ে অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত হয় স্মৃতি। মানুষ তার এক জীবনে নানারকম কাজকর্ম বা আচরণ করে। কখনো কখনো কাজ ও আচরণে তার মধ্যে অহংকারবোধের জন্ম হতে পারে। কখনো-বা জন্ম হতে পারে অপরাধবোধ। মানুষ যদি বিনীত না হয়, তবে অহংকারবোধ তাকে অন্য একজন মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আবার অপরাধবোধ থেকে মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়! কারণ অপরাধবোধ এমনই একটি বিষয় যে মানুষের মনকে ওই বোধ তাড়িত করে।

বয়স্ক শরীরের অনেক রকম পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে আছে হাঁটু বা কোমরে ব্যথা। হাত কাঁপা, শরীর কাঁপা। হাতের শক্তি কমে গিয়ে হাত থেকে জিনিস পড়ে যাওয়া। যেমন পানি খেতে গিয়ে গ্লাস পড়ে টেবিলে থেকে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। কিংবা হাত থেকে ভাতের থালাটিই পড়ে গেল। প্রয়োজনীয় কাজের জিনিসটি ভেঙে গেল। এতে তরুণ সদস্যদের বিরক্তি প্রকাশে অপরাধবোধের জন্ম হয়। একে কাজ ঠিকমতো গুছিয়ে না করার জন্য নিজের ভেতরে অপরাধবোধের দগ্ধতা, অন্যদিকে তরুণ সদস্যের বিরক্তিভাজন হওয়ার জন্য অপরাধবোধ। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে মরমে মরে যান প্রবীণ মানুষটি। ভাবতে থাকেন কেন তার বয়স হলো কিংবা মনে হতে পারে বয়স হওয়ার আগেই মরে যাওয়া ঢের সুখের! সেই সময় তার মনে পড়ে যাপিত দিনগুলোর কথা! যদি কোনো মানুষের মধ্যে একবার অপরাধবোধের জন্ম হয়, তাহলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না সেই মানুষটি। তাই কখনো তাদের কোনো কাজে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। বরং কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদের।

প্রবীণ হওয়ার পরে যদি কখনো তারা দেখতে পান সন্তানকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন সেভাবে সন্তান গড়ে ওঠে নি, সন্তানের সংসারটিও ভালো যাচ্ছে না, কিংবা যে মেয়ে পছন্দ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিংবা ছেলে পছন্দ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সংসারে তারা অশান্তিতে ভুগছে, তাহলেও প্রবীণ-মনে অপরাধবোধের জন্ম হতে পারে। মনে হতে পারে এভাবে বিয়ে না দিলেই হতো। এরপরে আছে ভুলে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা অনেকরকম হয়। যেমন কোনো জিনিস কোথায় রাখলেন, কিংবা কোথায় গেলেন। হয়ত তিনি দুই জায়গায় গিয়েছেন, পরিচিতজন বা বাড়ির সদস্যরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন এক জায়গার কথা। আর দ্বিতীয় স্থানের কথা তার মনে পড়ল দুইদিন পরে। তখন তো বলার সময় পেরিয়ে গেছে। তখন না বলা এবং ভুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কথা মনে হয় পরিবারের অন্য সদস্যরা কিছু মনে করে নি তো, কিংবা মিথ্যুক ভাবে নি তো! তরুণ সদস্যদের এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়।

প্রবীণরা সবচেয়ে অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন তখন যখন তারা তাদের নিজেদের কথা তরুণ সদস্যদের বুঝিয়ে বলতে পারেন না। তাদের কথা চালাচালিতে তরুণ সদস্যরা যদি সেকথা শুনতে না চেয়ে বলে, 'বাজে বকবক করো না তো' কিংবা 'যে কথা বুঝিয়ে বলতে পারো না তা বলো কেন' কিংবা

উদাসীন থাকে তরুণ সদস্য; তখন এই ধরনের আচরণে কষ্টের সঙ্গে অপরাধবোধ জন্ম হতে পারে। তার মনে হতে পারে কেন তিনি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না। হয়ত-বা কথা বলাই বন্ধ করে দিতে পারেন তিনি। কখনো কখনো রাগ হয় নিজের ওপর। কেন এমন হয়ে যাচ্ছেন, এমন তো ছিলেন না তিনি! কখনো যেন মনে না হয় তিনি এতটা সময় এদের জন্য ব্যয় করেছেন! অনেক সময় এরকম নানা ভাবনায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, আবার অশ্রু ঝরতে পারে মনে এবং চোখে। ঘুম না হওয়া আর কান্নায় প্রবীণ স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে নতুন প্রজন্মকে।

বর্তমানে অণু পরিবারের জন্ম হওয়ায় বেশিরভাগ প্রবীণেরা খুব একা হয়ে যান। মেয়ে বিয়ে হলে এখনো অন্যের সংসারে চলে যায় এবং বাবা-মায়ের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে পারে না। আর ছেলেদের কেউ কেউ বিদেশে চলে যায় কেউ-বা কর্মসূত্রে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকে। যারা বাইরে থাকে তারা ফোনে মাঝেমধ্যে প্রবীণ বাবা-মায়ের খবর নিলেও অনেক সময় তাদের সঙ্গ দেওয়ার সময় হয় না তাদের।

সামাজিক মূল্যায়ন : এই সমাজে এখনো প্রবীণদের কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। বয়স ৬০ পেরোলেই তাদের কাজে অক্ষম মনে করা হয়। কিন্তু ৬০ বছরের একজন মানুষ ৩০/৪০-এর মতো না হোক ৫০ বা তার অধিক বয়সের কাজের যোগ্য থাকেন। সামাজিকভাবে বিধবা হলে বা বয়সী হলে প্রবীণ নারীকে সাদা পোশাক পরতে হবে, তাদের রঙিন পোশাক মানায় না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত রঙিন পোশাক পরবে, তাদের তত উজ্জ্বল দেখাবে এবং তার বয়সী মনও প্রফুল্ল থাকবে। আর মন প্রফুল্ল থাকলে জীবনও সুন্দর হবে। অবশ্য আজকাল পূর্বের ধ্যান-ধারণা পালটাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, প্রবীণ বয়সেই রঙিন মানায় আর তরুণ বয়সে মানায় শুভ্র রং।

একাকিত্ব : আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রবীণ একা থাকেন। সন্তানেরা বড়ো হয়ে গেলে তারা বিদেশে থাকেন, কখনো কর্মসূত্রে অন্যত্র। পিতা-মাতাকে একাই থাকতে হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনই যদি বেঁচে থাকেন, তবে পাশাপাশি সঙ্গী হয়ে থাকেন; কিন্তু একজনের অবর্তমানে অন্যজন নিঃসঙ্গ একাকী। প্রবীণ বয়সে পিতা-মাতার দেখভালের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে, কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। সম্পর্ক কখনো আইন দিয়ে বাঁধা যায় না। সন্তানের একটা ফোনকল, সন্তানের বছরে দুইবার বাড়ি আসা, প্রবীণাবাসে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে মাসে-ছয়মাসে দেখা করলেই কি পিতা-মাতার একাকিত্ব দূর করা যাবে? আর সন্তান যদি উপার্জনক্ষম না হয়, তবে প্রবীণ পিতা-মাতার কী হবে? আর মেয়ে তো উপার্জন করলেও পিতা-মাতাকে দিতে পারে না তার উপার্জিত অর্থ। তাহলে যে বাবা-মায়ের শুধুই কন্যাসন্তান তার কী হবে?

চিত্তবিনোদন : প্রবীণ নারীদের ঠিকমতো খাওয়ারই যেখানে সংস্থান নেই, সেখানে তাদের চিত্তবিনোদনের কথা ভাবার সময় কোথায়? প্রবীণ নারীরা সংসারের কাজ করার ফাঁকে যেটুকু পাবেন, সেটুকু সময় এবাদত-পূজা-অর্চনার মাধ্যমে কাটাতে হবে, এটাই সামাজিক বিধান। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়ি পাহারায় রেখে যাওয়া হয়। সিনেমা-টিভি দেখলে কথা শুনতে হয়। এ সমাজ মনে করে না যে চিত্তবিনোদিত হলে মানুষের মন প্রফুল্ল থাকে, কর্মক্ষমতা ও আয়ু বাড়ে। সমাজ ভাবে, নারীর চিত্তবিনোদনের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ নারী গৃহপালিত (শিক্ষিত) জীব!

ভোগান্তি : প্রবীণ নারীদের বাড়িতেও কষ্ট, বাইরে চলাফেরাতেও কষ্ট। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বাসে কিংবা রিকশায় যেতে হয় (অধিকাংশ প্রবীণের নিজস্ব বাহন নেই)। রিকশায় উঠতে-নামতে প্রবীণদের অসুবিধা হয়। বাসে তাদের জন্য কোনো পৃথক সিটের ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া, ঠেলাঠেলি করে তারা উঠতেও পারে না। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে প্রবীণদের যাতায়াতের কোনো পৃথক ব্যবস্থা চালু করা হলে ভোগান্তি কিছু কমবে।

নিরাপত্তার অভাব : আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর নিরাপত্তার অভাব প্রকট। শুধু বয়সী নারী নয়, কোনো নারীই নিরাপদ নয়। অনেকদিন আগে 'তারা টিভি'র এক আলোচনা শুনেছিলাম, ওখানে যে প্রবীণ ব্যক্তিরা একা থাকেন তারা খুবই ভয়ে ভয়ে থাকেন। তারা মনে করেন, যদি দেখভাল করা মানুষটি তাকে নিরাপত্তা দিতে না পারে কিংবা তারাই যদি বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। কারণ সন্তানেরা সবাই বাইরে থাকে। এখন অবশ্য মাঝেমধ্যে কাগজ খুললে দেখা যায়, বয়সী মানুষেরা একান্ত কাছের জন থেকেও নিরাপদ নন!

বিশ্বের অনেক সমাজেই কমবেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হন প্রবীণেরা। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য ও বেকারত্বসহ নানারকম সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ-সমাজ। দারিদ্র্য বা অন্যান্য কারণে প্রবীণেরা নতুন প্রজন্মের কাছে থেকে কাঙ্ক্ষিত আচরণ পাচ্ছেন না। তবু বাঙালি সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক-ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধার জায়গাটি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় নি। প্রবীণের জন্য যারা কাজ করছে তাদের এবং সরকারের সদিচ্ছায় আশা করা যায় ভালো থাকবেন আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

আফরোজা অদিতি লেখক। afrozaaditi1953@gmail.com